গোষ্ঠীবদ্ধ জনতা এবং প্রজাতন্ত্রঃ ভারতের অনিশ্চিত ধর্মনিরপেক্ষতা

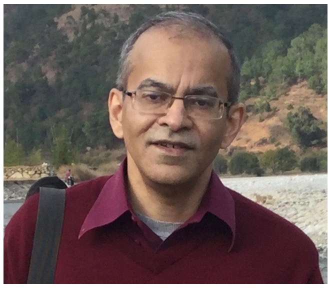

স্বাগত গাঙ্গুলি

১০ অক্টোবর, ২০২২

ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাকে সাড়ম্বরে সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের (বা সমস্ত ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা) দর্শন হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে, যা পাশ্চাত্যে প্রচলিত এর বিকল্প ধারণাগুলি থেকে খানিকটা ভিন্ন। ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার মূল সূত্রকে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের প্রথমদিককার দার্শনিক-রাষ্ট্রপতি ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ এইভাবে তুলে ধরেন "ইশ্বর ও মানুষের মধ্যে সম্পর্কটি আন্তরিকতাপূর্ণ সম্প্রীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, পশ্চিমে যে সম্পর্ক অনেক বেশি প্রতিকূলতার দ্বারা চিহ্নিত"। সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের অর্থ ভারতের সমস্ত প্রধান ধর্মকে সমকক্ষ হিসেবে দেখা হয় ও আনুকূল্য দেওয়া হয়। এর থেকে পাশ্চাত্যের ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা ভিন্ন, যাকে বৃহত্তরভাবে ধর্ম ও রাষ্ট্রের মধ্যে পৃথকীকরণকেই বোঝায়।

রাধাকৃষ্ণাণ থেকে শুরু করে, ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার অন্যান্য প্রবক্তারা এই ভিন্নতাকে ব্যাপকভাবে উদ্‌যাপন করেন এই মনে করে যে, ধর্মনিরপেক্ষতার এই বিকল্প ধারণাটি ভারতের পরিস্থিতির পক্ষে অনেক বেশি উপযুক্ত। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাজীব ভার্গব যেমন বলেন, "ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা বিভেদের সুদৃঢ় দেওয়াল তৈরি করে নি। বরং তা ধর্ম ও রাষ্ট্রের মধ্যে একটি "নীতিগত দূরত্ব" বজায় রাখার প্রস্তাব করেছিল। তার উপর, এই ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাটি ব্যক্তি ও ধর্মীয় গোষ্ঠীর দাবির মধ্যে একটি ভারসাম্য রেখে চলে, এবং সেই কারণে, এই ধারণাটির উদ্দেশ্য কখনই ধর্মের বেসরকারীকরণে বাধ্য করা ছিল না। এছাড়াও, এই ধারণাটি একটি প্রাসঙ্গিক নৈতিক যুক্তির আদর্শকে মূর্ত করে"। তবে, এই "নীতিগত দূরত্ব" সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ঠিক কতটা বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে এবং তা কতটা নৈতিক রাখা সম্ভব হয়েছে? অথবা, ধর্মনিরপেক্ষতার এত সূক্ষ্ম উপলব্ধি কি এমন এক সাজ্ঘাতিক পদস্খলনের শিকার হতে পারে, যার ফলে তা এক সময় ভঙ্গুর হয়ে পড়ে? এই নির্দিষ্ট ধারণাটি ধর্মনিরপেক্ষতার ঔপনিবেশিক সংজ্ঞা থেকে বা সম্রাট আকবরের দীন-ই-ইলাহি যেমন একটি সমন্বয়বাদী ধর্মীয় মতাদর্শ, সেই রকম উপনিবেশ-পূর্ববর্তী সময়ের ধারণাগুলি থেকে কতটা ভিন্ন?

এই বিষয়গুলি যে আবার সামনে এসেছে, তার কারণ বারাণসীর জ্ঞানবাপী মসজিদকে ঘিরে সাম্প্রতিক বিতর্ক। এই নতুন বিতর্ক শুরু হওয়ার ফলে অবশেষে দেশব্যাপী দাঙ্গার মধ্যে ধ্বংস করা হওয়া অযোধ্যার বাবরি মসজিদ নিয়ে যে সমস্যা সুদীর্ঘ সময় ধরে চলেছিল, তার স্মৃতিকে আবার জাগিয়ে দিয়েছে। এর ফলে, রাষ্ট্র সাংবিধানিকভাবে ভারতের যে ধর্মনিরপেক্ষতার

দর্শনকে তুলে ধরার শপথ করে, তার বর্তমান অবস্থার উপর আলোকপাত করেছে। ২০১৯ সালে ভারতের সর্বোচ্চ আদালত বা সুপ্রিম কোর্ট একটি সর্বসম্মত রায়ের মাধ্যমে বাবরি মসজিদ বিতর্কের সমাধান আনার চেষ্টা করে। এই রায়ে, ধ্বংস হওয়া মসজিদের জায়গায়, হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের দাবি অনুযায়ী রাম মন্দির নির্মাণের এবং একটি নতুন মসজিদের জন্য অযোধ্যাতেই একটি বিকল্প স্থানের ব্যবস্থা করার অনুমতি দেওয়া হয়। এই সিদ্ধান্তটি প্লেসেস অফ ওয়ারশিপ (স্পেশাল প্রভিসনস) অ্যাক্ট ১৯৯১ আহ্বান করে। এই আইন অনুযায়ী, কোনও উপাসনাস্থলের ধর্মীয় চরিত্র, ১৯৪৭ সালের পনেরই আগস্ট, যখন সদ্য স্বাধীন ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের প্রচলন হয়, তখন যেমন ছিল তা হুবহু বজায় রাখতে হবে। বাবরি মসজিদের ঘটনাটিকে একটি ব্যতিক্রম হিসেবেই ধরা হয়েছে, কারণ এই মসজিদ ঘিরে বিবাদ ১৯৪৭ সালের অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছে বলে দাবি করা হয়।

যদি মনে হয় যে, ২০১৯-এর সুপ্রিম কোর্টের রায় ধর্মীয় স্থান ঘিরে বারংবার সমস্যা তৈরি হওয়া বন্ধ করতে সাহায্য করবে, তবে তা মিথ্যে বলে প্রমাণিত হয় যখন হিন্দু আবেদনকারীরা জ্ঞানবাপী মসজিদের ভিতর দৈনিক উপাসনার অনুমতি চান এবং বারাণসীর একটি আদালত এই মসজিদ প্রাঙ্গণে কোনও গুপ্ত হিন্দু শিল্পকর্মের উপস্থিতি আছে কিনা তা অনুসন্ধানের নির্দেশ দেয়। আবেদনকারীদের পক্ষের উকিল দাবি করেন যে, মসজিদের ওজুখানার (ইসলামধর্মাবলম্বীরা প্রার্থনার আগে আচমনের জায়গা) ভিতরে একটি শিবলিঙ্গের (পাথরের তৈরি লিঙ্গ যা শিবের প্রতিরূপ) অবস্থিতির প্রমাণ পাওয়া গেছে এবং আদালত তারপর ওজুখানাটি বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দেয়। এর ফলে যেন একটি প্যান্ডোরার বাক্স খুলে গেছে, কারণ এই নির্দেশের পরে, গোটা দেশে জুড়ে অন্যান্য মসজিদ সম্বন্ধে একই দাবি জানান শুরু হয়ে গেছে। ভারতের প্রতিটি প্রধান মসজিদ যেগুলি একশ বছরের বেশি পুরনো সেগুলিতে একই বিষয়ে অনুসন্ধান চালান এবং তার পাশাপাশি, ওজুর কাজে মসজিদ প্রাঙ্গণের পুকুর ও কুয়োর ব্যবহার বন্ধ করার দাবি জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে একটি আবেদন করা হয়েছে। এমনকি, প্লেসেস অফ ওয়ারশিপ আইনের বৈধতাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে – মধ্যযুগের মুসলিম শাসকদের সঙ্গে জড়িত তাজ মহল ও দিল্লীর কুতুব মিনারের মত গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক চিহ্নকগুলি সম্বন্ধেও অনুসন্ধান চালানর আবেদন করা হচ্ছে। এই রকমের বিবাদ যে অন্তহীন ধর্মীয় দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা উন্মুক্ত করে, তা এমনকি হিন্দু জাতীয়তাবাদী দল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস), যা কিনা বাবরি মসজিদ ধ্বংস আন্দোলনের প্রধান চালক ছিল, তাকেও শঙ্কিত করেছে। আরএসএস প্রধান মোহন ভগত মন্তব্য করেছেন, “প্রতিটি মসজিদেই কেন শিবলিঙ্গ খুঁজে বেড়াতে হবে?”

ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার চর্চার ধারাটি লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে, এই ধারণাটি ভারতীয় ধর্মকে কেন্দ্র করে আগেকার ঔপনিবেশিক বিতর্কের অংশবিশেষকে আজও ধারণ করে রেখেছে, যে অংশ আবার দক্ষিণপন্থী হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের

সমসাময়িক মতবাদেও ছড়িয়ে আছে। মুসলিম আক্রমণকারীদের দ্বারা হিন্দু সভ্যতার বারংবার নিপীড়িত হওয়ার অধি-আখ্যানটি এই সমাপতনের একটি উদাহরণ। জেমস টড ও হেনরি এলিয়টের মত প্রাচ্যবিদ পণ্ডিত যাঁরা ব্রিটিশ রাজকে আগেকার মুসলিম শাসকদের থেকে শ্রেষ্ঠতর বলে প্রতিষ্ঠা করতে চাইতেন, লুণ্ঠনপ্রিয় আক্রমণকারী হিসেবে মুসলিমদের চিত্রিত করা তাঁদের একটি পছন্দের নকশা, যার পুনরাবৃত্তি সাম্প্রতিক হিন্দু জাতীয়তাবাদী বিতর্কেও ঘটে চলেছে। ভারত একটি দেশ যা ধর্মভাবে এতটাই পরিব্যাপ্ত থাকার কথা যে, সাধারণ অর্থে ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে যা বোঝায় – ধর্ম ও রাষ্ট্রের মধ্যে পৃথকীভবন – তাকে ভারতের পক্ষে উপযুক্ত বলে মনে করা হয় না। *আইডোলেটরি অ্যান্ড দ্য কলোনিয়াল আইডিয়া অফ ইন্ডিয়াঃ ভিশনস অফ হরর, অ্যালেগোরিজ অফ এনলাইটেনমেন্ট* (রাটলেজ, ২০১৮) নামের আমার লেখা বইতে আমি ব্যাখ্যা করেছি যে, ভারতের অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিকতা, যা পার্থিব জগতকে প্রত্যাখ্যান করে, তার ধারণাকে জার্মান ভারতবিশারদ ফ্রিডরিখ ম্যাক্স মুলার তাঁর কাজে জোর করে সামিল করেছেন এবং ভারতের উপর কলকারখানাকেন্দ্রিক সভ্যতার বিরুদ্ধে এক রোমান্টিক সমালোচকের ভূমিকা চাপিয়ে দিয়েছেন। তাঁর কাজের সম্ভার – বিশেষ করে তাঁর *ইন্ডিয়াঃ হোয়াট ক্যান ইট টিচ আস?* নামের বিতর্কিত পুস্তিকাটি – ভারতের জাতীয়তাবাদ এবং তার ধর্মনিরপেক্ষ বিকল্পটিকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছে।

ধর্ম ও রাষ্ট্রের মধ্যে পৃথকীকরণ, যাকে একটি "পাশ্চাত্য" ধারণা বলে দেখা হয়, তার বদলে এই ধরনের প্রাচ্যবাদী তত্ত্বে ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার কল্পনার সঙ্গে হয়ত মোগল সম্রাট আকবরের দীন-ই-ইলাহির বেশি সাদৃশ্য দেখা যায়। আকবরের প্রচেষ্টা ছিল, হিন্দু বা ইসলাম ধর্ম সহ খৃস্টান, জৈন এবং জরাথ্রুষ্টবাদের মত তাঁর সাম্রাজ্যে প্রচলিত সমস্ত ধর্মের উপাদান সমন্বিত করে এই দীন-ই-ইলাহি মতবাদের নির্মান করা। স্বাধীন ভারতের কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে হজযাত্রার ব্যয়, শিখ উপাসনালয়, মুসলিম ওয়াকফ বোর্ড এবং হিন্দু ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অনুদানের পরিচালনা করার বা পৃষ্ঠপোষকতা দানের ইতিহাস আছে। ধর্ম ও রাষ্ট্রের পৃথকীকরণের "পাশ্চাত্য" ধারণাটির জায়গায়, সমস্ত ধর্মকে সমানভাবে আনুকূল্য দেওয়ার এই প্রচেষ্টার ফলে, ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাটির নানা সমস্যার মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয় এবং এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে খুবই কমসংখ্যক মানুষকে খুশি করা যায়, কারণ একটি ধর্মকে আনুকূল্য দিলে, অন্য ধর্ম সেই পদক্ষেপকে নিজেদের জন্য ক্ষতিকর বলে ধরে নেয়। এই মনোভাবের কারণে পরিচয়ের রাজনীতিতে ধর্মনিরপেক্ষতার কল্পনাটি কলঙ্কিত হয়। এছাড়াও, ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) এবং সঙ্ঘ পরিবার সাধারণত যে সংখ্যাগরিষ্ঠের যুক্তি পেশ করে তার সামনে সেই কল্পনা দুর্বল হয়ে পড়েঃ যদি রাষ্ট্রকে ধর্মের প্রতি অনুকূল মনোভাবই দেখাতে হয়, তবে তার উচিত সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্ম, অর্থাৎ হিন্দুধর্মকেই সুপ্রচুর আনুকূল্য দেওয়া।

ধর্মভিত্তিক ব্যক্তিগত আইনকে কেন্দ্র করে যে সমস্যাগুলি তৈরি হয় তা ভারতের পরস্পরবিরোধী ধর্মনিরপেক্ষতার উভয়সঙ্কটকে সামনে আনে। বিশ্বব্যাপী ধর্মনিরপেক্ষতার চর্চা থেকে এর পার্থক্য আছে, এবং প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তান সঙ্গে বরং এর অনেকটাই মিল। পাকিস্তানও ধর্মনিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থার পরিবর্তে, একটি ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থার উপর নির্ভর করে, অর্থাৎ বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার বা বংশগতির ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিগত আইন প্রচলনে বিশ্বাস করে।

ধর্মনিরপেক্ষ ভারত ও ইসলামী পাকিস্তান, দুই দেশেরই ব্যক্তিগত আইন কার্যত ব্রিটিশ রাজের উত্তরাধিকার, যার আইনি শাসন, এই সমস্ত বিষয়ে ধর্মীয় অনুশাসনের উপর নির্ভর করত। এর থেকে বোঝা যায় যে, ব্রিটিশ শাসকরা ভারতকে একটি বহু ধর্মের সংকলন হিসেবে দেখত, জাতিসত্ত্বা হিসেবে যে কোনও অতিরিক্ত সুবিধা পায় না। আধুনিক নাগরিকত্ব স্তরযুক্ত নয়, বরং একটি সমতল ছাঁচের উপর নির্ভর করে। ঔপনিবেশিক নকশায় যেমন ক্ষমতাপ্রাপ্ত গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের দলপতিদের মাধ্যমে নানা অধিকারের বিতরণ করা হত, তার পরিবর্তে নাগরিকত্বের এই স্তরযুক্ত নকশার মাধ্যমে জাতি-রাষ্ট্র সাংবিধানিক ও আইনি অধিকারের একটি পরিকল্পনার মাধ্যমে সরাসরি নাগরিকদের ক্ষমতায়নে সাহায্য করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সুহাস পালসিকার যেমন বলেছেন, ভারতে "জাতি ও গোষ্ঠী নাগরিকত্বের রূপদান করে...গোষ্ঠীগুলি এত স্পষ্টতই বিচ্ছিন্ন যে, "জন" সম্পর্কে প্রতিটি গোষ্ঠীরই একটি পৃথক ধারণা আছে, যার ফলে জনকল্যাণের ধারণাও গোষ্ঠী অনুযায়ী বদলে যায়"। পরিবর্তনের তীব্রতার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা ভারতের প্রধান লড়াইগুলির মধ্যে একটি, যা ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার তত্ত্বকেও সীমাবদ্ধ করে, সেটি হল এমন একটি সমতল এবং অভিন্ন নাগরিকত্বের ধারণায় পৌঁছন যা সকলেরই কল্যাণের কথা বিবেচনা করে চলে।

ধর্মনিরপেক্ষতাকে ধর্মের প্রতি রাষ্ট্রের অপক্ষপাতের বদলে বহুধর্মবাদ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করার ফলে, ভারতীয় রাষ্ট্রনীতি নানা চরম বিন্দুর মধ্যে ক্রমাগত যাতায়াত করে এবং একটি নিশ্চিত অবস্থান খুঁজে পেতে অক্ষম হয়। এই জাতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণার সমস্যা হল, এটি প্রতিটি গোষ্ঠীকে চার দেওয়ালের মাঝে আবদ্ধ বাগিচা এবং প্রতিটি ব্যক্তিকে তাদের আরোপিত পরিচয়ের বন্দী বলে মনে করে। এই মনোভাব আধুনিক নাগরিকত্বের ধারণার সঙ্গে একেবারেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, এবং তার পাশাপাশি ব্যক্তিমানুষ যে নিজেই নিজের পরিচয় নির্মাণ করতে সক্ষম – এই উদারনৈতিক কল্পনার সঙ্গেও সঙ্গতিপূর্ণ নয়। সম্প্রতি, প্রবীণ কংগ্রেস নেতা মনীষ তেওয়ারি একটি সাক্ষাৎকারে ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতার বিচ্ছিন্নতাবাদী চরিত্রের কথা স্বীকার করে বলেন, "ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্নটি বেশ কিছু সময় ধরে কংগ্রেস দলকে বিব্রত করছে। ধর্মনিরপেক্ষতার একমাত্র

অর্থ কি *সর্ব ধর্ম সমন্বয়,* নাকি আমাদের নেহরুর ধর্মনিরপেক্ষতার সংজ্ঞা, যা ধর্ম ও রাষ্ট্রকে কঠোরভাবে পৃথক রাখায় বিশ্বাস করত, তাতে ফিরে যাওয়ার সময় এসেছে,?

এই সংজ্ঞাটিই হয়ত সত্যিই ধর্মনিরেপক্ষতা নিয়ে নেহরুর উপলব্ধিকে চিত্রিত করে। কিন্তু ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী বা তাঁর উত্তরাধিকারীরা কখনই এই ধারণাকে বাস্তবায়িত করতে পারেন নি। যদিও, ধর্মকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া এই ভাঙ্গনকে মেরামত করার উদ্দেশ্যে অনেক বিকল্প নিয়েই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। কিন্তু, ধর্মনিরপেক্ষতা সম্বন্ধে একটি উদার বোধ, যা সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের বদলে রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত এবং নাগরিকতা সম্পর্কে একটি আধুনিক ও উপনিবেশ-পরবর্তী দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ, এমন একটি পন্থার অন্বেষণ খুবই কম হয়েছে।

স্বাগত গাঙ্গুলি সিএএসআই-র নন-রেসিডেন্ট ভিজিটিং ফেলো এবং ২০২২ সালের স্প্রিং-এ তিনি একজন ভিজিটিং ফেলো ছিলেন। তিনি দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়ার সম্পাদকীয় পৃষ্ঠার সম্পাদক ছিলেন (২০০৯-২০২১)।